বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ

তানহি খান তানহা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

পূর্ণমান: ৩৫

ভাষা (পূর্ণমান: ১৫)

শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, পদ, বাক্য, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বানান ও বাক্যশুদ্ধি

পরিভাষা, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ

সাহিত্য (পূর্ণমান: ২০)

প্রাচীন যুগ

মধ্যযুগ

আধুনিক যুগ (১৮০০ - বর্তমান পর্যন্ত)

বিসিএস বাংলা সাহিত্য

প্রথম ভাগঃ প্রাচীন এবং মধ্যযুগ

ক্রমিক নং	টপিকের নাম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪২তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
০১	প্রাচীন যুগ	১			১						-
	চর্যাপদ			২		১	২	১	২	-	২
	অন্যান্য সাহিত্য										
০২	মধ্যযুগ	৫	৪		১						
	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য							১		১	
	মঙ্গলকাব্য			১						১	১
	বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী						১	১	২		
	জীবনী সাহিত্য					১	১				
	লোক সাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা						১	১	১		
	অনুবাদ সাহিত্য										১
	নাথ ও মর্সিয়া সাহিত্য								১		
	রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান										১
	আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য			১				১		১	১

বিসিএস প্রশ্ন

০১. চর্যাপদের কবিরা ছিলেন? -৪৬ বিসিএস

০২. চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ প্রকাশ করেন কে? –৪৫ বিসিএস

০৩. চর্যাপদের প্রাপ্তিস্থান কোথায়? -৪৩ বিসিএস

০৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কি ? -৪৩ বিসিএস

০৫. রুখের তেস্তুলি কুম্ভীরে খাই এই কথার অর্থ কি? -৪৩ বিসিএস

০৬. কোন সাহিত্য কর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে? -৪২ বিসিএস

০৭. চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী? -৪১ বিসিএস

বিসিএস প্রশ্ন

১. চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? -৪০ বিসিএস

২. সন্ধ্যাভাষা কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত? -৩৮ বিসিএস

৩. চর্যাচর্যবিনিশ্চয় অর্থ কী? -৩৭ বিসিএস

৪. ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? -৩৭ বিসিএস

৫. সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির? -৩৫ বিসিএস

৬. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি? -৩৫ বিসিএস

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

সাহিত্যকর্মের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ করা হয়। বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ নির্ধারিত হয়েছে প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা হয়-

প্রাচীন যুগ: ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

মধ্যযুগ: ১২০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

আধুনিক যুগ: ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল।

প্রাচীন যুগ

এ যুগের একমাত্র লিখিত নিদর্শন **চর্যাপদ**। এর ভাষা ও বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য। এর কবিরা ছিলেন বৌদ্ধ সাধক। তাঁদের সাধনার গূঢ় তত্ত্ব কবিতার চরণে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রাচীন যুগের সাহিত্যের অলিখিত নিদর্শনগুলো হলো

- ছড়া
- রূপকথা
- প্রবাদ

প্রাচীন যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

ধর্মনির্ভরতা ও

গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা

চর্যাপদ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন

চর্যাপদ

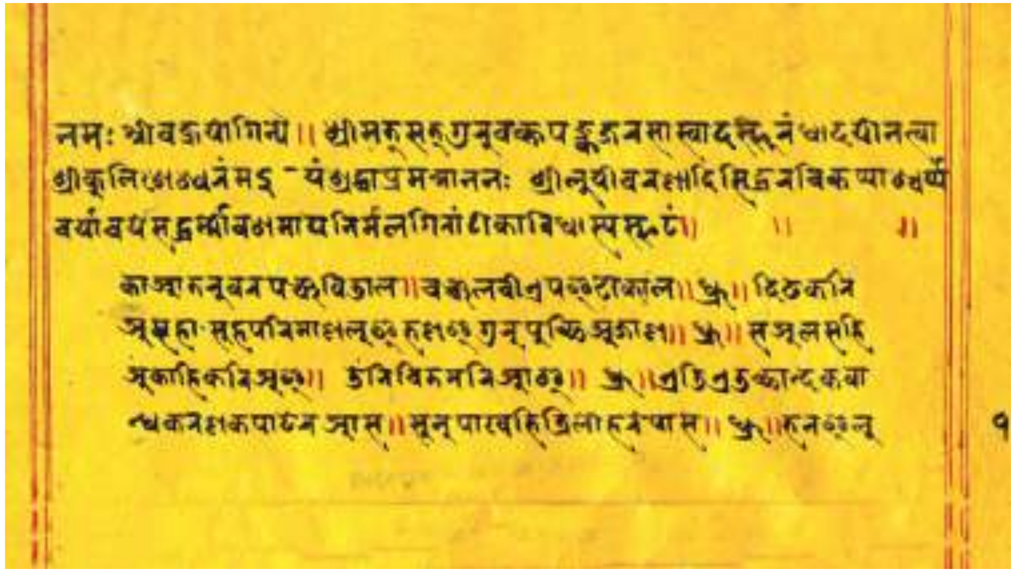

ধর্মমত

চর্যাপদ হলো বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সংগীত।

চর্যাপদ

চর্যাপদ মূলত কতগুলো পদ বা কবিতা বা গানের সংকলন। তখনকার সময়ে কবিতা পড়া হতো না। কবিতা গানের মত করে গাওয়া হতো। তাই অনেকেই একে গানের সংকলন বলে থাকেন।

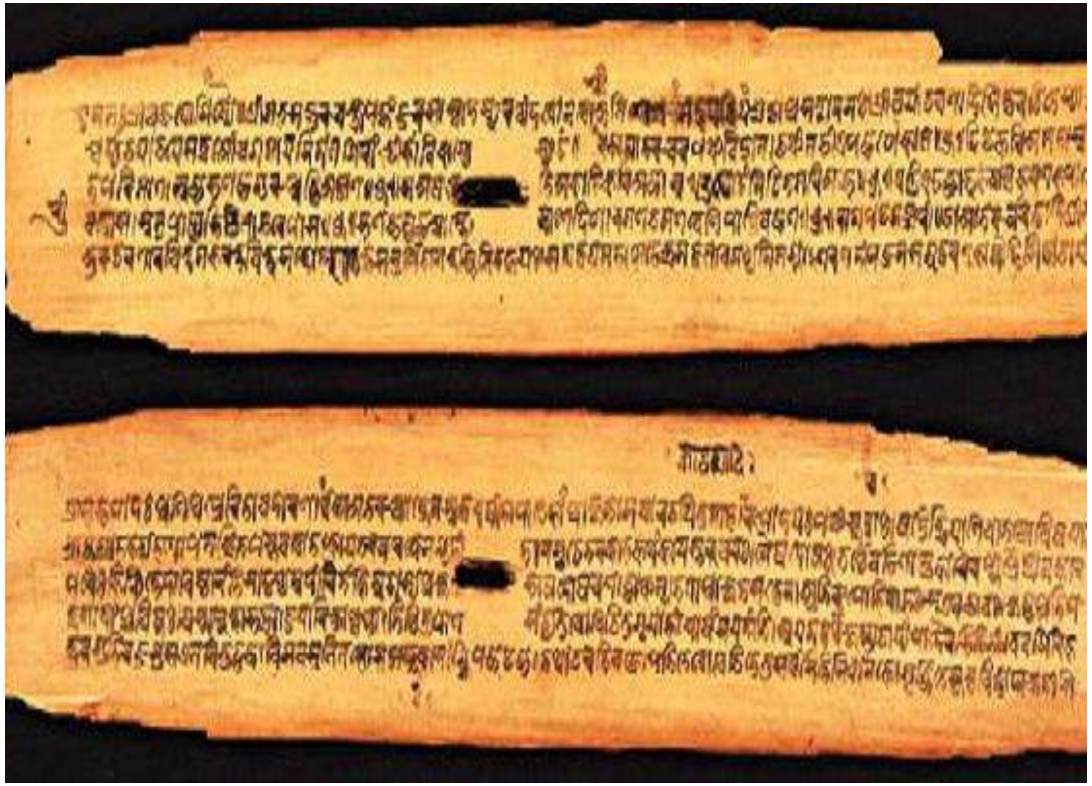

সহজিয়া

- চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা বিধৃত হয়েছে।
- সহজিয়া একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়, যারা সহজপথে সাধনা করে।
- চর্যাপদে সহজিয়াদের সাধনতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। এই সহজযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধনার সংগীত হলো চর্যাপদ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির নিগূঢ় রহস্য চর্যাপদে রূপায়ণ করেছেন।

Sanskrit Buddhist Literature in Nepal

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮২ সালে নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুথির একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকাটির নাম ছিল- **Sanskrit Buddhist Literature in Nepal**

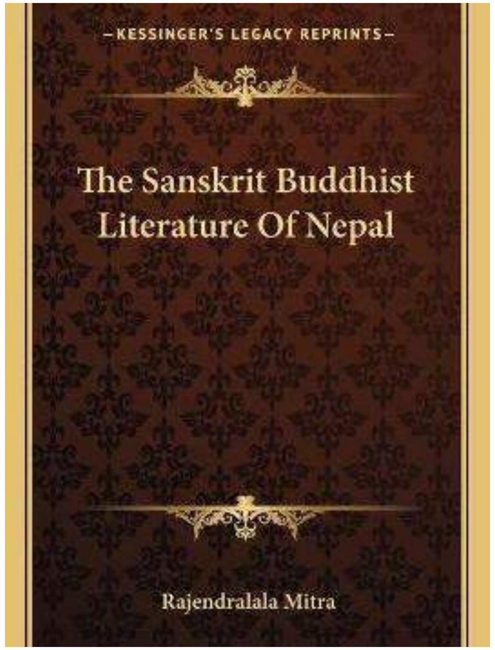

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (২৬.৭.১৮৯১) মৃত্যুর পর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যা অঞ্চলের পুথি সংগ্রহের দায়িত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)'র উপর।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি ছিল **মহামহোপাধ্যায়**।

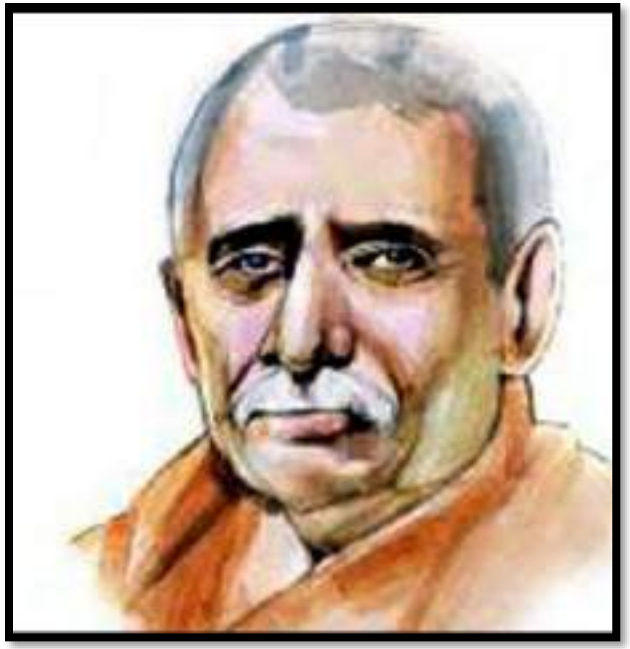

অনুসন্ধিৎসু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন বাংলার পুথির খোঁজে দুইবার নেপালে নেপাল যান ১৮৯৭, ১৮৯৮ সালে।

তৃতীয় বার নেপাল যান ১৯০৭ সালে।

১৯০৭

১৯০৭ সালে নেপাল ভ্রমণের সময়

তিনি **নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে**

কিছু নতুন পুথির সন্ধান পান।

পুথিগুলো হলো

- চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
- সরহপাদের দোহা
- কৃষ্ণপাদের দোহা
- ডাকার্ণব পুঁথি।

পুথি

- **পুথি হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ।** মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সবকিছুই হাতে লেখা হতো। তখন কোনো গ্রন্থ রচিত হওয়ার পর গুরুত্ব ও চাহিদা অনুযায়ী তার একাধিক অনুলিপি করা হতো।

- **পুথিকে বর্তমানে 'পান্ডুলিপি' (manuscript) ও বলা হয়।** যে উপাদানে পুথি লেখা হতো তার বর্ণ হতো সাধারণত পান্ডু বা ধূসর। তাই হয়তো এর নাম হয়েছে পান্ডুলিপি। এখন অবশ্য মুদ্রণের পূর্বে যেকোনো রচনার খসড়াকেই পান্ডুলিপি বলে।

- কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে পুথি লেখার লেখপত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো চামড়া, ভূর্জপত্র, তেরেটপত্র, গাছের বাকল, কলাপাতা, তালপাতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান। এগুলিকে জলে ভিজিয়ে, সেদ্ধ করে এবং রোদে শুকিয়ে লেখার উপযোগী করা হতো। ফলে এর বর্ণ হতো পান্ডু বা ধূসর এবং এতে সহজে পোকা লাগত না। সেকালে পুথি লিপি করার জন্য এক শ্রেণীর পেশাজীবী লোক ছিলেন, **যাঁদের বলা হতো লিপিকর।** তাঁরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুথি নকল করতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের পদবি হতো 'শর্মা', তবে অন্যান্য পদবিও ছিল।

‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'

ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদনায় আবিষ্কৃত পুথিগুলো একত্রে **‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা'** নামে সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ **১৯১৬** সালে **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ** থেকে প্রকাশিত হয়।

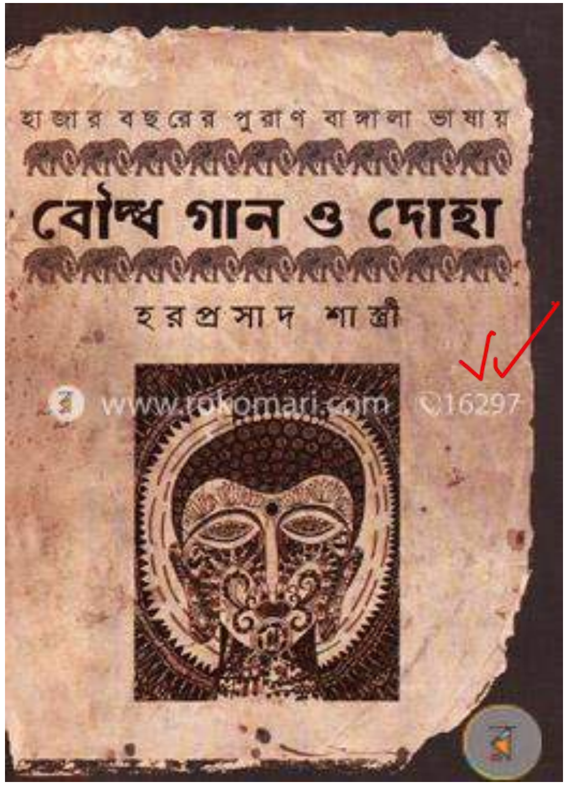

দোঁহা: ‘প্রাচীন বাংলার অপভ্রংশ ও মধ্যযুগের হিন্দিতে রচিত দুই চরণ বিশিষ্ট পদ’

চর্যাপদের নামকরণ নিয়ে নানা মত

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত পুথিটি মূল পুথি নয়, মূল পুথির নকলমাত্র এবং মূল পুথিটি যেহেতু এপর্যন্ত অনাবিষ্কৃত, সেই কারণে পরবর্তীকালে চর্যা-পদাবলির প্রকৃত নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

চর্যাপদের নামকরণ নিয়ে নানা মত

- নেপাল রাজদরবারের পুথিশালার ক্যাটালগে যে নামটি আছে- ‘চর্য্যাচর্য্যটীকা’
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে : ‘চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়’ ।
- নেপালের প্রাপ্ত পুথিতে নাম : ‘চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'

  এখানে চর্য্য : যা আচরণীয়, অচর্য্য : যা আচরণীয় নয়। বিনিশ্চয় : নিশ্চিতভাবে জানা।
- ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে : ‘চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়’ । (ড. সুকুমার সেন এ মত সমর্থন করেছেন)
- তিব্বতি অনুবাদের নাম : ‘চর্যাগীতিকোষবৃত্তি’ ।

  এতে মনে করা হয় মূল সংকলনের নাম ছিল : ‘চর্যাগীতিকোষ’ ।
- সংস্কৃত টীকার নাম : ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’ ।
- **চর্যাপদের সংস্কৃত টীকাকার মুনিদত্ত।**

সন্ধ্যা ভাষা

- চর্যাপদগুলোর ভিতরে রয়েছে নানা ধরনের দুর্বোধ্য ভাব। **এর আক্ষরিক অর্থের সাথে ভাবগত অর্থের ব্যাপক ব্যবধান আছে।** ফলে এই পদগুলোতে বুঝা-না-বুঝার দ্বন্দ্ব রয়ে যায়। সেই কারণে চর্যায় ব্যবহৃত **ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন সন্ধ্যাভাষা।** তাঁর মতে-

- 'সহজিয়া ধর্মের সকল বই-ই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিকটা বুঝা যায় না। অর্থাৎ, এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধনভজন করেন তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই।'

সান্ধ্যভাষা/সন্ধ্যাভাষা

- যে ভাষা নির্দিষ্ট কোন রূপ পায়নি, যে ভাষার অর্থ একাধিক অর্থাৎ আলো-আঁধারের মতো সে ভাষাকে পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা বা সান্ধ্যা ভাষা বলেন। এ ধরনের ভাষারীতিতে শব্দের দুটি অর্থ থাকে।

- একটি সাধারণ অর্থ
- অন্যটি নিগুঢ় অর্থ।

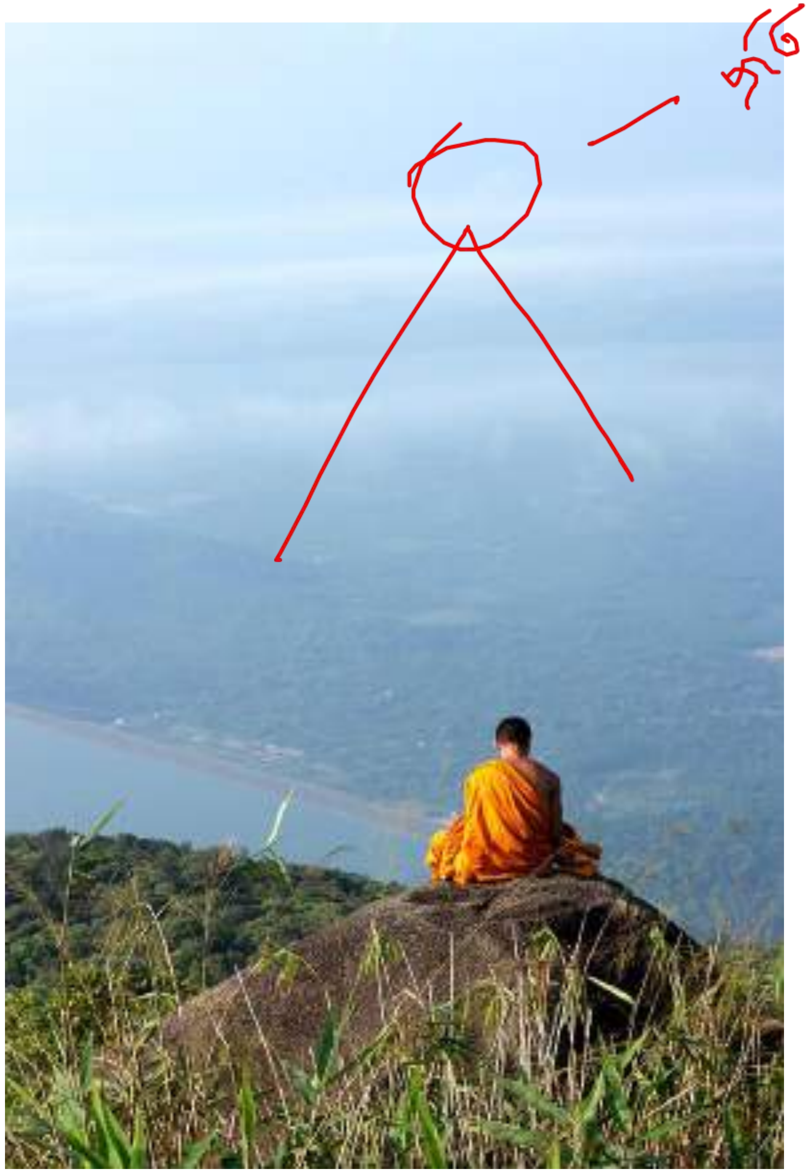

‘টালত ঘর মোর নাহি পরিবেষী।
হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।’ -ঢেণ্ঢনপা

আপাত দৃষ্টিতে এর অর্থ ‘পাহাড়ের টিলায় আমার ঘর কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, কিন্তু নিত্যই অতিথি আসে’

অর্থাৎ এখানে কোনো এক দরিদ্র গৃহস্থের সংসারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এটি প্রতীকী। আর এই প্রতীকের মাধ্যমে তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

টিলার উপরে আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই - অর্থাৎ চেতনার শীর্ষদেশে উঠেছি, এখন আমার চারদিকের মায়ার জগৎ আর নেই, সংসার চেতনা ও বিনাশ পেয়েছে।

এভাবে পদগুলোতে সন্ধ্যাভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে সাধকগণ তাদের সাধনকথা ফুটিয়ে তুলেছেন।

চর্যাপদের ভাষা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে বাংলা বলে দাবি করলে **বিজয় চন্দ্র মজুমদার** এই ব্যাপারে আপত্তি জানান।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার ইতিহাস বিষয়ে ১৯২০ সালে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতামালার ত্রয়োদশ পর্বে তিনি চর্যাপদের ভাষা নিয়ে তার পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য ব্যক্ত করেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যার ভাষায় **হিন্দি বৈশিষ্ট্য ও উড়িয়া প্রাধান্যের কথা বলেন।**

চর্যাপদের ভাষা

চর্যাপদের ভাষা বাংলা নয় এ নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার **১৯২০ সালে** History of the Bengali language গ্রন্থে

চর্যাপদের ভাষা

চর্যাপদ যখন রচিত হয় তখন বাংলা ভাষা পুরোপুরি স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে ওঠেনি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দাবি করেন চর্যাপদের ভাষা বাংলা, **রাহুল সাংকৃত্যায়ন দাবি করেন এর ভাষা হিন্দি;** একইভাবে বিভিন্ন ভাষার গবেষকবৃন্দ তাঁদের ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের সম্পর্ক অন্বেষণ করেছেন এবং চর্যাপদকে নিজেদের মাতৃভাষার আদি নমুনা হিসেবে দাবি করেছেন।

বিভিন্ন ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন

এ কারণে প্রকাশিত হবার পর একে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীরা তাদের নিজ নিজ ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে দাবি করেছেন।

চর্যাপদের পদগুলাতে **৫টি ভাষার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় -** বাংলা, হিন্দি, মৈথিলী, অসমীয়া ও উড়িয়া।

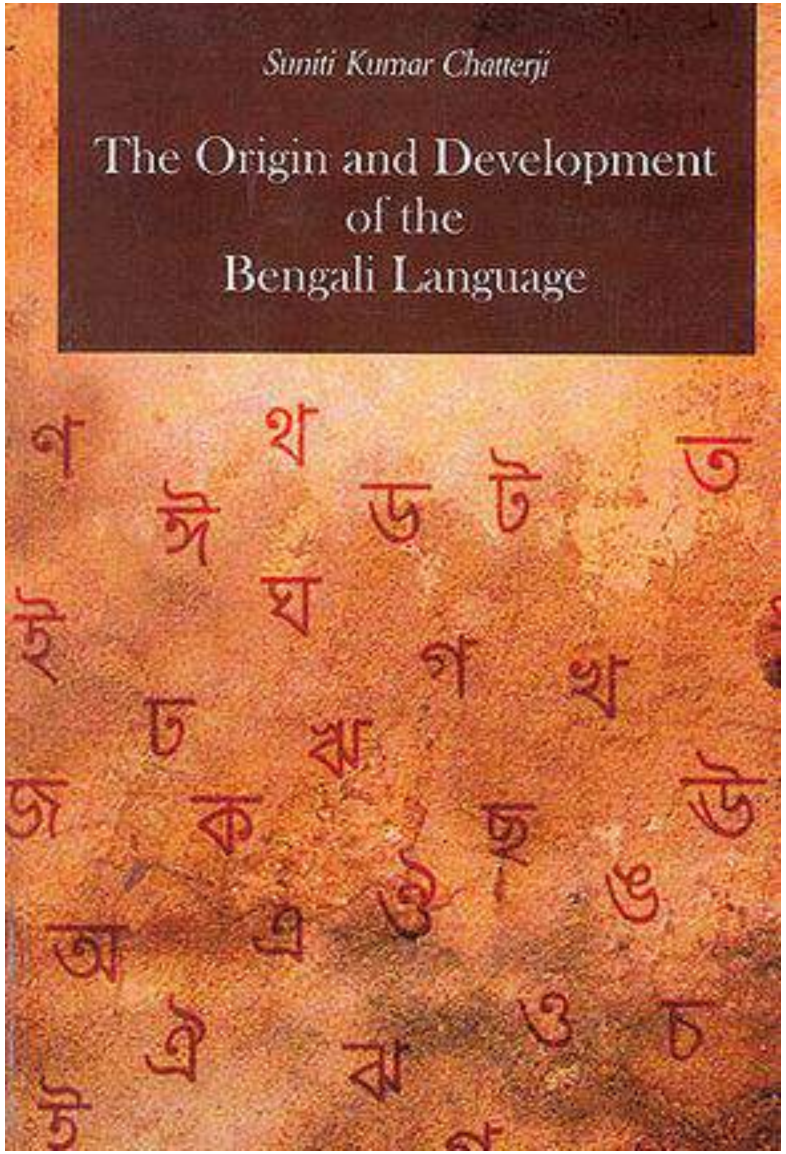

চর্যাপদের ভাষা

চর্যাপদের প্রথম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬** সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ Origin and Development of the Bengali Language **(ODBL)** এ।

চর্যাপদের ভাষা

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Origin and Development of Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিস্তারিতভাবে চর্যাপদের ভাষার **ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার সম্পদ।**

অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী এ অভিমত সমর্থন করেন।

এছাড়াও চর্যার **কবিদের নাম, পদ্মা নদীর নামের উল্লেখ (ভুসুকুপার ৪৯নং পদে ‘পউয়া খাল')** প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষারই আদি নিদর্শন।

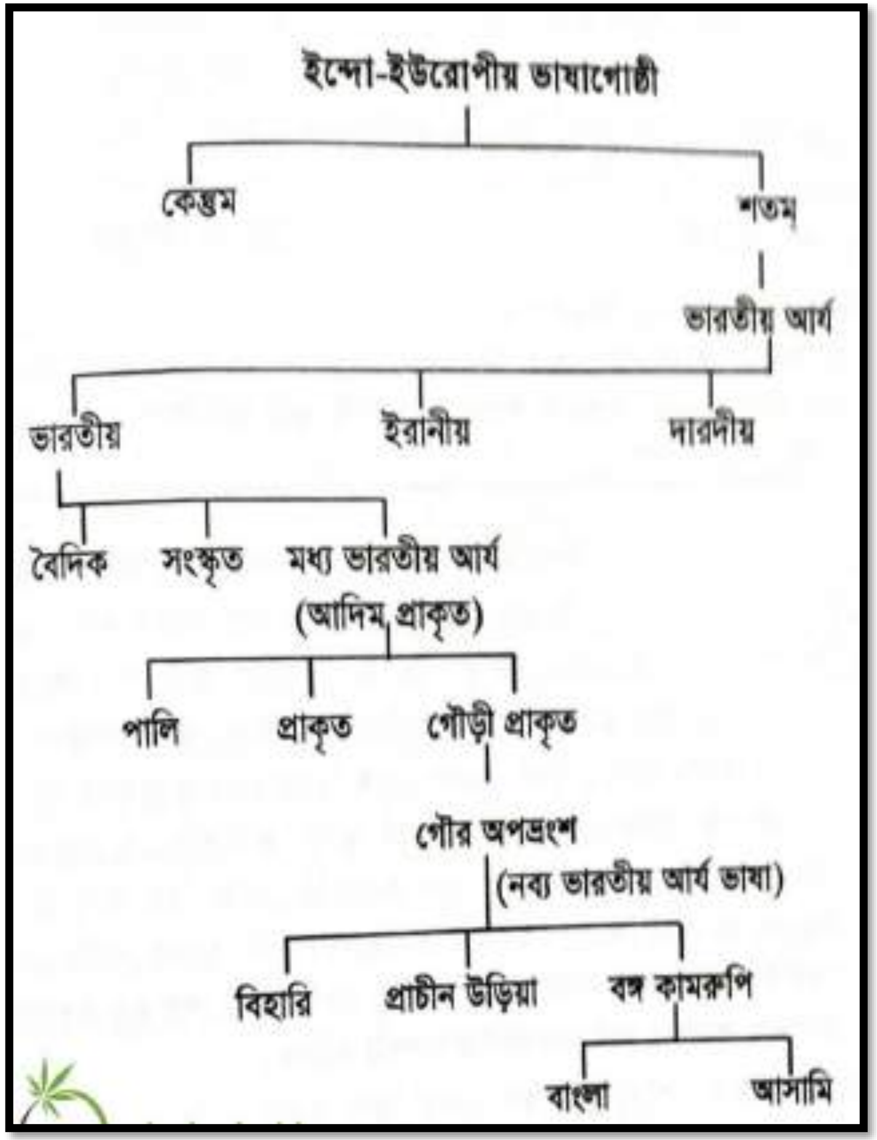

চর্যাপদের ভাষা

ড. শহীদুল্লাহর মতে

চর্যাপদের ভাষা

বঙ্গকামরূপী

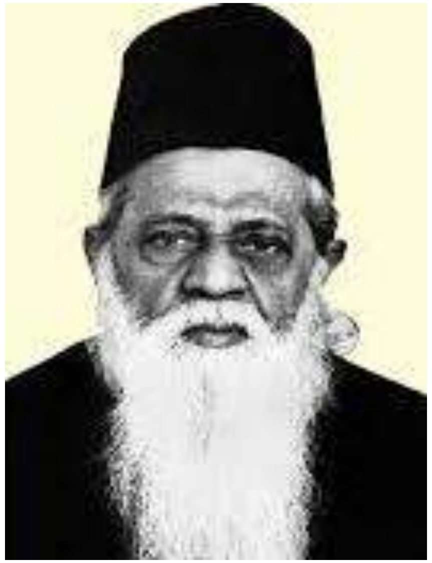

চর্যাপদ

- বাংলা সাহিত্যের **প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শন:** চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ।
- চর্যাপদ মূলত: **গানের সংকলন**। এর মূল বিষয়বস্তু- বৌদ্ধ ধর্ম মতে সাধনভজনের তত্ত্ব প্রকাশ।
- সাধারণত: **বৌদ্ধ সহজিয়াগণ** চর্যাগুলো রচনা করেন।
- চর্যাপদের আবিষ্কারক: **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী**। উপাধি: মহামহোপাধ্যায়।
- **নেপালের রয়েল লাইব্রেরি** থেকে, ১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কার করা হয়।
- **১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে** (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদ আধুনিক লিপিতে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- চর্যায় ব্যবহৃত **ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন সন্ধ্যাভাষা।**
- চর্যাপদের পদগুলাতে **৫টি ভাষার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় -** বাংলা, হিন্দি, মৈথিলী, অসমীয়া ও উড়িয়া।
- চর্যাপদের ভাষা বাংলা নয় এ নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার **১৯২০ সালে।**
- **রাহুল সাংকৃত্যায়ন দাবি করেন এর ভাষা হিন্দি।**
- চর্যাপদের প্রথম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** ১৯২৬ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) এ।
- ভাষার **ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার সম্পদ।**
- ড. শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা **বঙ্গকামরূপী**

চর্যাপদের রচনাকাল

১৯০৭

৬৫০ - ১২০০

বাংলা ভাষা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন বাংলা ভাষার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছিল ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলাভাষা বর্তমান রূপ লাভ করেছে আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর (৯৫০-১২০০) মধ্যবর্তী সময়ে।

চর্যাপদের রচনাকাল

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে চর্যাপদের রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী (৯৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যার রচনাকাল সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী (৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)।

চর্যাপদের রচনাকাল

পাল আমলে চর্যাপদের পদগুলা লিখা শুরু হয়

এবং **সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীকাল** জুড়ে

এগুলো লিখিত হয়।

চর্যাপদ নেপালে পাওয়ার কারণ

- **বাংলার পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন।** তাঁদের আমলে চর্যাগীতিকাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। পাল বংশের পরে পরেই বাংলাদেশে সেন, বর্মণ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গৃহীত হয় এবং দেশি ভাষা বাংলার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা প্রাধান্য লাভ করে।

- পাল রাজাদের উদারপন্থী বৌদ্ধ মতবাদের পরিবর্তে **সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের প্রাধান্যের ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়।** সেন রাজাদের প্রতাপের জন্যই বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছিল। **তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলাদেশের বাইরে নেপালে পাওয়া গেছে।**

চর্যাগীতির পদসংখ্যা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত পুথিটিতে পূর্ণাঙ্গ পদ পাওয়া গেছে ৪৬টি।

এই গ্রন্থের ২৩নং পদের অর্ধাংশ পাওয়া গিয়েছিল।

৪৬

৩ টি কবিতা নষ্ট হয়ে গেছে

২৪, ২৫ এবং ৪৮ নং কবিতা।

অর্ধেক পাওয়া গেছে

চর্যাপদের ২৩ নং কবিতার

৬ লাইন পাওয়া গেছে

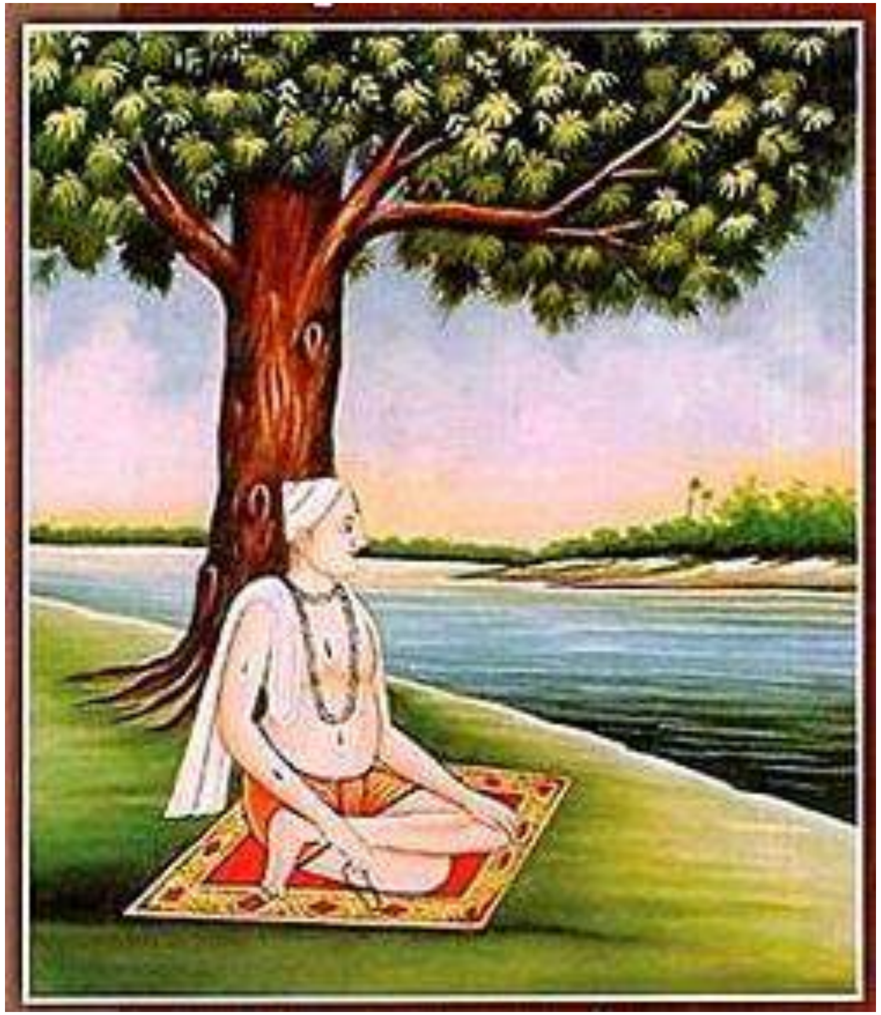

মুণিদত্ত

এই পুথিতেই সংস্কৃত টীকা ছিল।

মুণিদত্ত **১১ নং পদ** ব্যাখ্যা করেননি।

টীকা → ১১ নং

(টীকা: ব্যাখ্যা সম্বলিত, পুস্তক, টিপ্পনী)

মুণিদত্তের টীকা

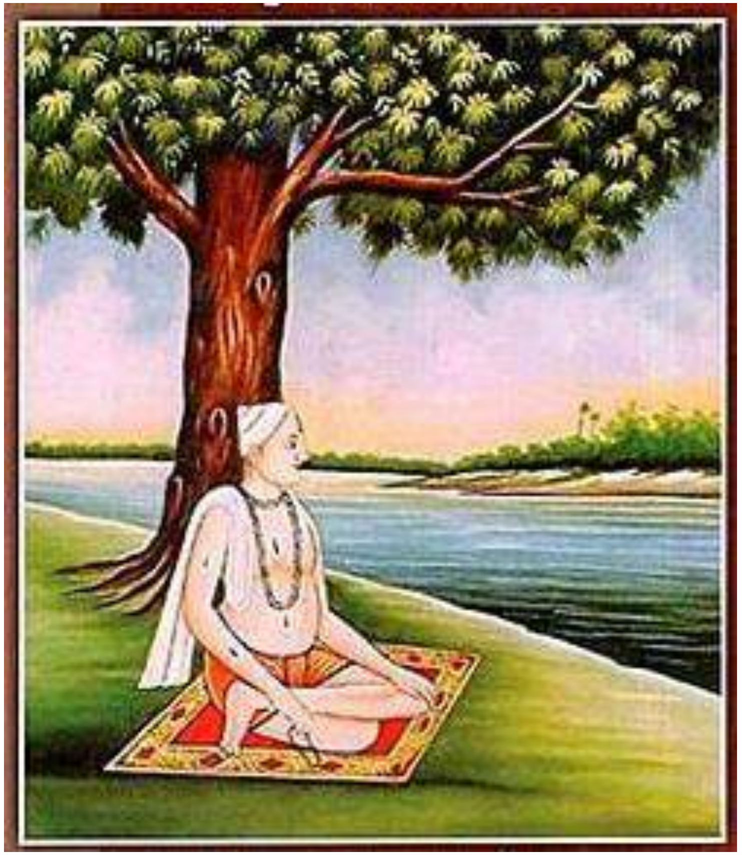

- **সংস্কৃত ভাষায় লেখা চর্যার টীকার নাম হল নির্মলগিরা টীকা**। টীকাকার হলেন মুনিদত্ত। এই টীকা না থাকলে চর্যাপদের মত **দু'রকম অর্থবোধক সন্ধ্যা ভাষার এই গানগুলির অর্থ বোঝা যেত না।** পরিবেশিত বৌদ্ধ দর্শন ও তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বোঝা দুরূহ হতো। মূলে নেই, এমন কিছু চর্যাপদের পদ্যাংশ মুনিদত্ত তার টীকাতে প্রয়োগ করেছেন, যা থেকে পরবর্তী গবেষকেরা ধরতে পেরেছিলেন যে নেপাল অঞ্চলে আরও বহু চর্যাপদ ছড়িয়ে আছে। আর সেই সূত্র ধরেই নব চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়।

- এই টীকাতেই তিনি মূল চর্যাগানগুলি (৫০টি) সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন, যা না দিলে আমরা জানতে পারতাম না যে চর্যাগীতির মতো প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় লেখা এমন ৫০টি গান আছে, যেগুলো দশম থেকে দ্বাদশ শতকেই বাঙালিরা রচনা করেছিলেন।

সুকুমার সেন

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)

কবিতা ৫১ টি,

কবি ২৪ জন।

ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(Buddhist Mystic Songs)

কবিতা ৫০টি।

কবি ২৩ জন।

চর্যার পদসংখ্যা ৫০/৫১

- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে পুথিটি আবিষ্কার করেছেন তা মূল পুথি নয় বরং একটি 'নোট বই' বা 'মানে বই' বা 'গাইড বই'। পুথি সংকলনের বহু আগে গানের পুথি আর টীকার পুথি আলাদা আলাদা ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য গান আর টীকা একটি বইতে সংযুক্ত হলো। কোনো এক লিপিকর চর্যার মূল পুথি ও টীকার পুথি পাশাপাশি রেখে সেখান থেকে পদ ও টীকা সংগ্রহ করে এই লিপিটি তৈরি করেছেন। নেপালে প্রাপ্ত পুথিতে দেখা যায় ১০ নং পদের পরে লিখিত আছে,
- **"লাড়ীডোম্বীপাদানাম সুনেত্যাদি চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।"**

চর্যার পদসংখ্যা ৫০/৫১

- এই কথা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে আবিষ্কৃত পুথির লিপিকর যে টীকার পুথি দেখে অনুলিপিটি তৈরি করেছিলেন সেখানে ১০ নং পদের পরের পদটির টীকা লিখা ছিলোনা। যদিও পদের পুথিটিতে ১০ নং পদের পরে লাড়ীডোম্বী পা রচিত একটি পদ ছিলো কিন্তু টীকা না থাকায় সেটি আবিষ্কৃত চর্যার পুথিতে সংযুক্ত হয়নি। এর থেকেই বোঝা যায় যে চর্যার মূল গ্রন্থে অন্তত আর একটি পদ ছিলো যার রচয়িতা লাড়ীডোম্বী পা। সে অনুসারে চর্যাপদের পদ সংখ্যা ৫১ টি।
- * **চর্যাপদের অনুলিপির লিপিকাল বার শতক বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।** নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে চর্যাপদের যে পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা বাংলা লিপিতে লেখা এবং তা বাঙালির লেখা বলে অনুমান করা হয়।

চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ

- চর্যাপদ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন **কীর্তিচন্দ্র।**
- ১৯৩৮ সালে এ অনুবাদ আবিষ্কার করেন ড. **প্রবোধচন্দ্র বাগচী।**
- ২৩ নং পদের শেষাংশ এবং না-পাওয়া ৩টি পদ তিব্বতী অনুবাদ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

চর্যাপদের টীকার তিব্বতি অনুবাদ

- চর্যার টীকার তিব্বতি অনুবাদক হলেন কীর্তিচন্দ্র। তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী। তিব্বতি অনুবাদের সম্পাদক ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী।
- হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত পুথিটি যে মূল চর্যাসংকলন (চর্যাগীতি) নয়, তা যে মূল চর্যাসহ টীকাগ্রন্থ, তা এই তিব্বতি অনুবাদ থেকেই জানা যায়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত টীকাগ্রন্থে টীকাকারের নাম নেই। এই তিব্বতি অনুবাদ থেকেই জানা যায়, টীকাকারের নাম মুনিদত্ত।
- এই অনুবাদ থেকে জানা যায়, মূল চর্যাগীতিকোষে ১০০টি পদ ছিল। তা থেকে মুনিদত্ত ৫০টি পদ বেছে নিয়ে বর্তমান টীকাটি রচনা করেছিলেন। হরপ্রসাদ আবিষ্কৃত পুথিতে যে সাড়ে ৩টি পদ হারিয়ে হারিয়ে গেছে, এই অনুবাদ থেকেই তার ভাববস্তু জানা যায়।

চর্যাপদে কবির সংখ্যা

১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যাপদে পাওয়া পদের সংখ্যা ছিল সাড়ে ছেচল্লিশটি যার পদকর্তা ২২ জন। কিন্তু সংস্কৃত টীকাকার মুনিদত্তের টীকায় ২৪ জন পদকর্তার নাম পাওয়া গিয়েছিল। সেদিক থেকে ২ জনের কোন পদ পাওয়া যায় নি বলা হয়। এরা হলেন-

(১) তন্ত্রী পা

(২) লাড়ীডোম্বী পা।

কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৯৩৮ সালে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের ১ টি তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন। যার মধ্যে ২৫ নং পদের পদকর্তা হিসাবে তন্ত্রী পার নাম পাওয়া গেলেও **লাড়ীডোম্বীপার কোন পদই পাওয়া যায় নি।**

চর্যাপদে কবির সংখ্যা

চর্যাপদে মোট ২৪ জন কবির নাম পাওয়া যায়

১ জন কবির পদ পাওয়া যায়নি তার নাম – লাড়ীডোম্বীপা

সেই হিসেবে পদ প্রাপ্ত কবির মোট সংখ্যা ২৩ জন

ধর্মমত

চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৭ সালে।

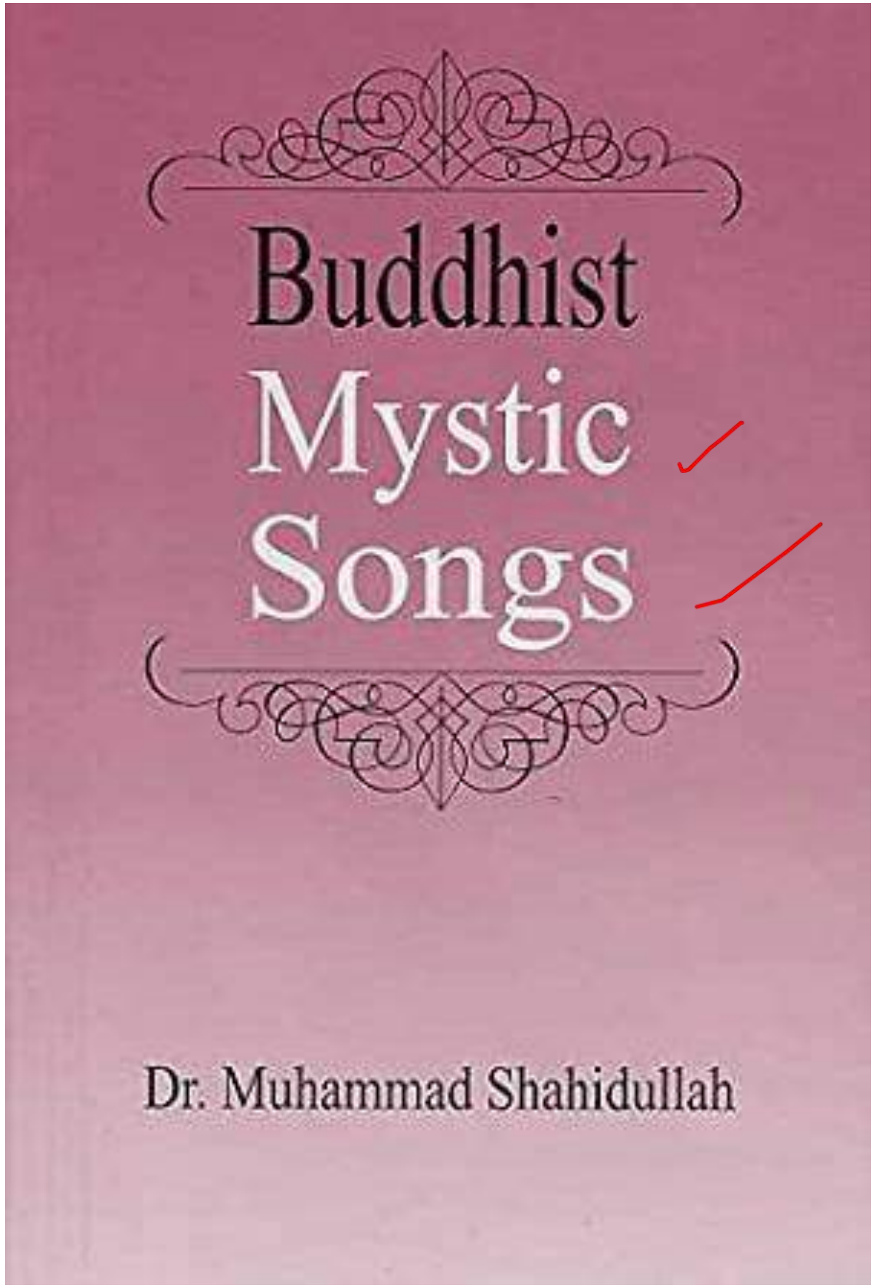

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

Buddhist Mystic Songs

প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে।

চর্যাগীতিকা

- আনোয়ার পাশা ও আবদুল হাই

চর্যাগীতিকা

সৈয়দ আলী আহসান

কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
'The Origin and Development of the Bengali Language'	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
Buddhist Mystic Songs	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ।
চর্যাগীতিকা	আনোয়ার পাশা ও আবদুল হাই ।
নতুন চর্যাপদ	সৈয়দ মুহম্মদ শাহেদ

কবিদের নাম শেষে পা দেওয়ার কারণ

পদ > পাদ > পা

পাদ > পদ > পা

পদ রচনা করেন যিনি তাদেরকে পদকর্তা বলা হত যার অর্থ সিদ্ধাচার্য / সাধক [এরা বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধক ছিলেন]

২ টি কারণে নাম শেষে পা দেওয়া হতঃ

১. পদ রচনা করতেন

২. সম্মান / গৌরবসূচক কারনে

কাহ্নপা

চর্যাপদের সবচে বেশি পদ রচনা করেছেন কাহ্নপা।

তার কবিতা ১৩ টি।

এই সংখ্যাধিক্যের পরিপেক্ষিতে তাঁকে **কবি ও সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা যায়।**

কানু পা কৃষ্ণপাদ ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিত। বিভিন্ন পদে কাহ্ন, কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্ন, কাহ্নি, কাহ্নিলা, কাফিল্য প্রভৃতি ভণিতা লক্ষ করা যায়।

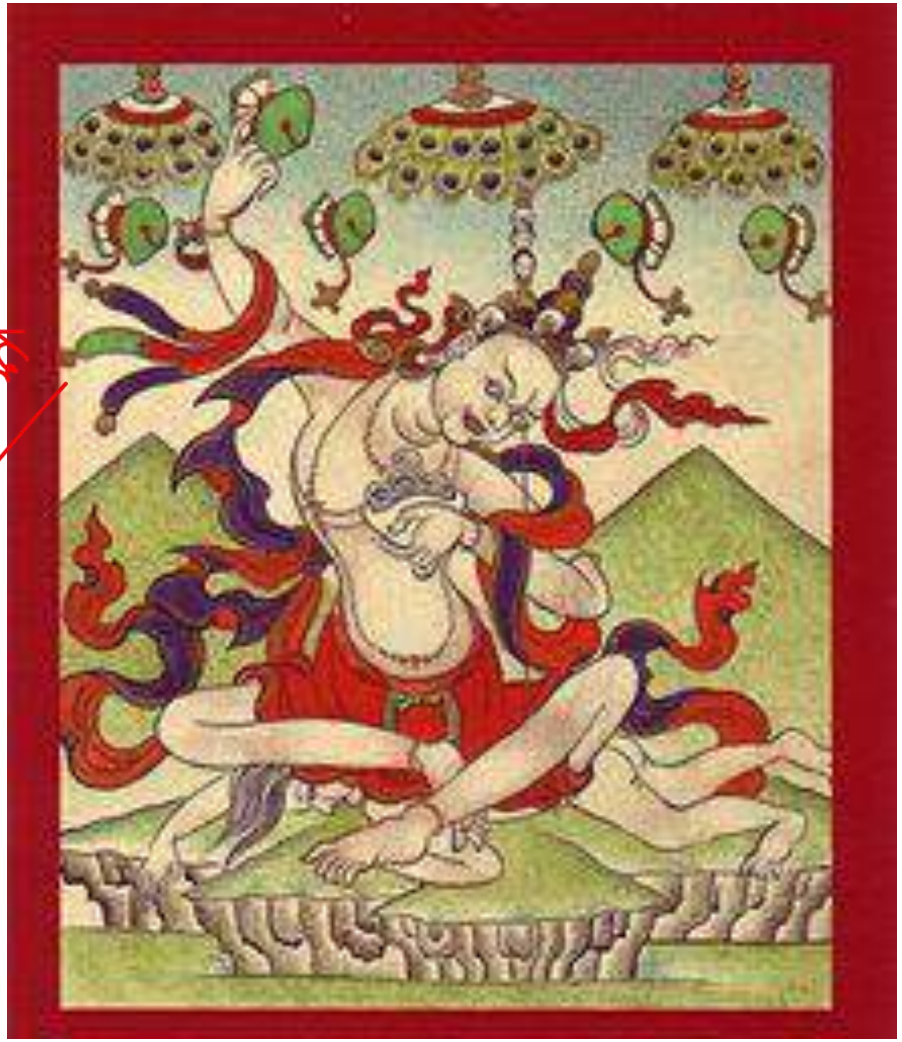

২য় সর্বোচ্চ কবিতা

চর্যাপদের ২য় সর্বোচ্চ কবিতা রচনা করেছেন ভুসুকু পা।

তার কবিতা ৮ টি।

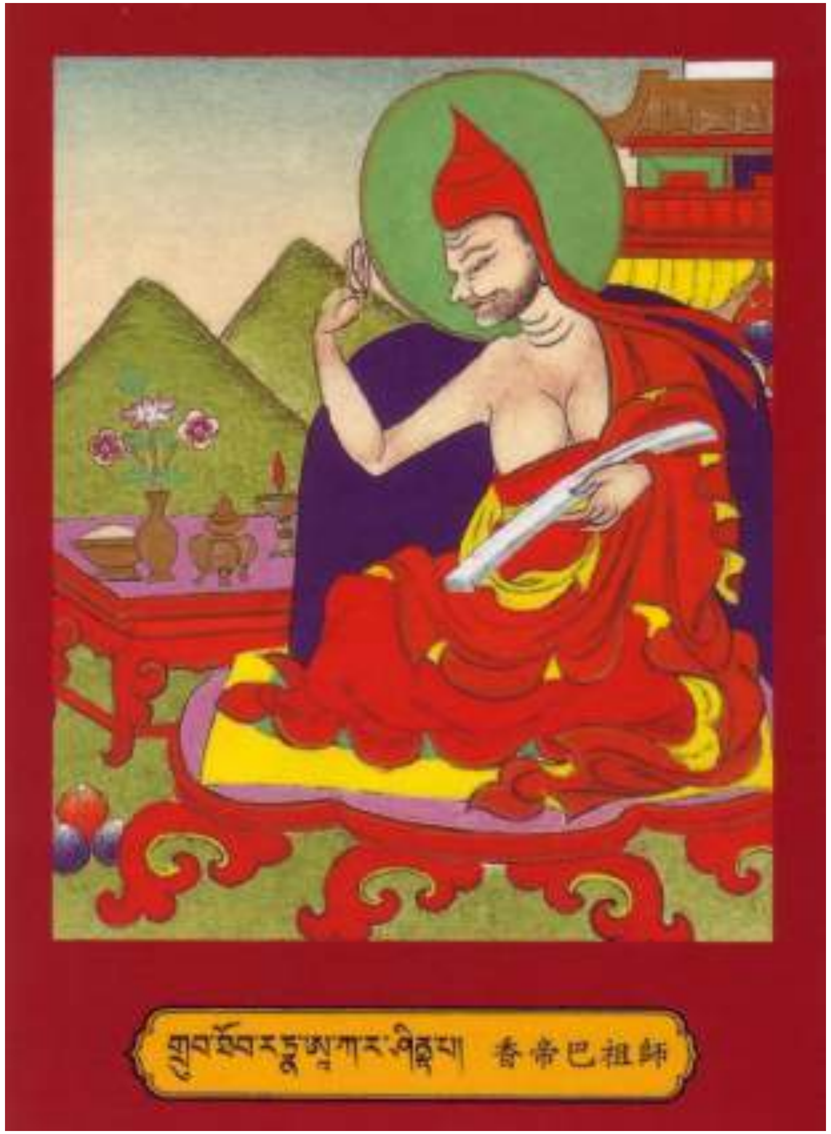

ভুসুকুপা

অনুমান করা হয় ভুসুকুপা পূর্ব বাংলার কবি। **তার আসল নাম শান্তিদেব পিতৃপ্রদত্ত নাম শান্তিবর্মা।** তিনি সৌরাষ্ট্রের রাজা কল্যাণবর্মার পুত্র ছিলেন। খুব সম্ভব ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে তিনি বেঁচে ছিলেন। সেটি ছিল ৭৭০-৮৫০ সাল। তিনি নিজের কুটিরে সর্বক্ষণ গোপনে অধ্যয়ন করতেন বলে অন্য ভিক্ষুরা মনে করতেন, তিনি অলস, সব সময় আহার এবং নিদ্রায় সময় কাটান। **এই কারণে ভিক্ষুরা তাকে ভুসুকু (ভু=ভক্ষণ, সু=সুপ্তি, কু=কুটির) নামে ডাকতেন। চর্যাপদে তাঁর রচিত পদের সংখ্যা ৮টি।** এগুলো হলো- ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯। তার পদগুলোতে পদ্মা (পঁউআ) খাল, বঙ্গাল দেশ ও বঙ্গালীর কথা আছে। এছাড়া একটি পদে তিনি নিজেকে বাঙালি কবি বলে দাবি করেছেন।

‘আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী ।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী ‘

এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে তিনি বাঙালি কবি। শেষ জীবনে তিনি নালন্দায় বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে অবস্থান করেন।

ভুসুকু পা

আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী...

পদ্মা নদী

৪৯ নং পদ

বাঙালি কবি

লুইপা, শবর পা, কুক্কুরীপা, বিরুবাপা, জয়নন্দীপা এবং **ভুসুকু পা**

নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন **ভুসুকু পা**

কনিষ্ঠ কবি

চর্যাপদের ৩য় সর্বোচ্চ কবিতা রচনা করেছেন সরহ পা-৪টি

কুক্কুরী পা

চর্যাপদের ৪র্থ সর্বোচ্চ কবিতা রচনা করেছেন কুক্কুরী পা-৩টি

একমাত্র মহিলা কবি

কুক্কুরী পা

“দিবসহি বহূড়ী কাউহি ডর ভাই।

রাতি ভইলে কামরু জাই।।” (পদ- ০২)

"সে দিনের বেলায় কাকের ডাকে ভয় পায়,

কিন্তু রাতে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

কুক্কুরী পা

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জানান, অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে কুক্কুরী পা বর্তমান ছিলেন। তারানাথের মতে, সবসময় সাথে একটি কুক্কুরী রাখতেন বলে তিনি কুক্কুরী পা নামে পরিচিত হয়ে যান।
- **ড. সুকুমার সেন ধারণা পোষণ করেন যে, কুক্কুরীপার ভাষার সাথে নারীদের ভাষার মিল আছে। তাই তিনি নারীও হতে পারেন।**

আদি কবি

লুইপা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে

প্রাচীন কবি শবর পা

সর্বোচ্চ কবিতা

চর্যাপদের সবচে বেশি পদ রচনা করেছেন কাহ্নপা।তার কবিতা ১৩ টি।

চর্যাপদের ৩য় সর্বোচ্চ কবিতা রচনা করেছেন সরহ পা-৪টি

চর্যাপদের ৪র্থ সর্বোচ্চ কবিতা রচনা করেছেন কুক্কুরী পা-৩টি

২ টি করে কবিতা লিখেছে ৩ জন কবি।

১-লুই পা (১, ২৯)

২-শবর পা (২৮, ৫০)

৩-শান্তি পা (১৫, ২৬)

যে পদগুলো পাওয়া যায়নি সেগুলোর রচয়িতা

২৩ নং পদ- ভুসুকুপা

২৪- কাহ্নপা

২৫- তন্ত্রীপা

৪৮- কুক্কুরীপা

পদসংখ্যা কার কতটি?

পদকর্তার নাম	রচিত পদসংখ্যা	প্রাপ্ত পদসংখ্যা
কাহ্নপা	১৩টি	১২টি
ভুসুকুপা	৮টি	সাড়ে ৭টি (৭.৬)
সরহপা	৪টি	৪টি
কুক্কুরীপা	৩টি	২টি

লুইপা, শান্তিপা, শবরপা ২টি করে এবং অন্যরা ১টি করে পদ রচনা করেন

চর্যাপদের ছন্দ

চর্যাপদ **মাত্রাবৃত্ত** ছন্দে রচিত।

চর্যাপদের সমাজচিত্র

চর্যাপদে মূলত অন্ত্যজ সমাজের চিত্র লিপিকৃত হয়েছে। জাতি পরিচয়ে দেখেছি **শবর, শবরী, ছত্তাল, ডোম জাতির** কথা লিপিকৃত । তৎকালীন সমাজে জাতীভেদ প্রথা ছিল কঠোর। সমাজে উঁচু নিচু ভেদাভেদ ছিল প্রবল। অন্ত্যজ মানুষের নগরে প্রবেশের অধিকার ছিল না।

এই সব মানুষ বিচিত্র পেশাকে তাদের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের **কেউ মদ বিক্রয় করে, কেউ মাঝি বৃত্তি করে, কেউ তাঁতবুনে, কেউ শিকার করে, কেউ বাঁশের চাঙ্গারি বিক্রি** করে সংসার চালাত।

৬টি প্রবাদ বাক্য

- আপণা মাংসে হরিণা বৈরী। (৬নং পদ, ভুসুকু পা) অর্থ-হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু।
- হাতের কাঙ্কন মা লোউ দাপন। (৩২ নং পদ, সরহপা) অর্থ- হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পন প্রয়োজন হয় না।
- হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। (৩৩ নং পদ, ঢেণ্ডণ পা) অর্থ- হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকরা এসে ভীড় করে।
- দুহিল দুধু কি বেন্টে_সামায়। (৩৩ নং পদ, ঢেণ্ডণ পা) অর্থ- দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?
- বর সুন গোহালী কিমু দুঠ্য বলন্দে। (৩৯ নং পদ, সরহপা) অর্থ- দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল ।
- আন চাহন্তে আন বিনঠা। (৪৪নং পদ, কঙ্কণপা) অর্থ- অন্য চাহিতে, অন্য বিনষ্ট ।

চর্যাপদ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন

পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের কন্যা **হাসনা মওদুদ**।

অনুবাদ গ্রন্থের নাম মিস্টিক পোয়েট্রি অফ বাংলাদেশ।

এটি প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লীভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা

চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদ

অনুবাদ গ্রন্থের নাম মিস্টিক পোয়েট্রি অফ বাংলাদেশ।

এটি প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লীভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা

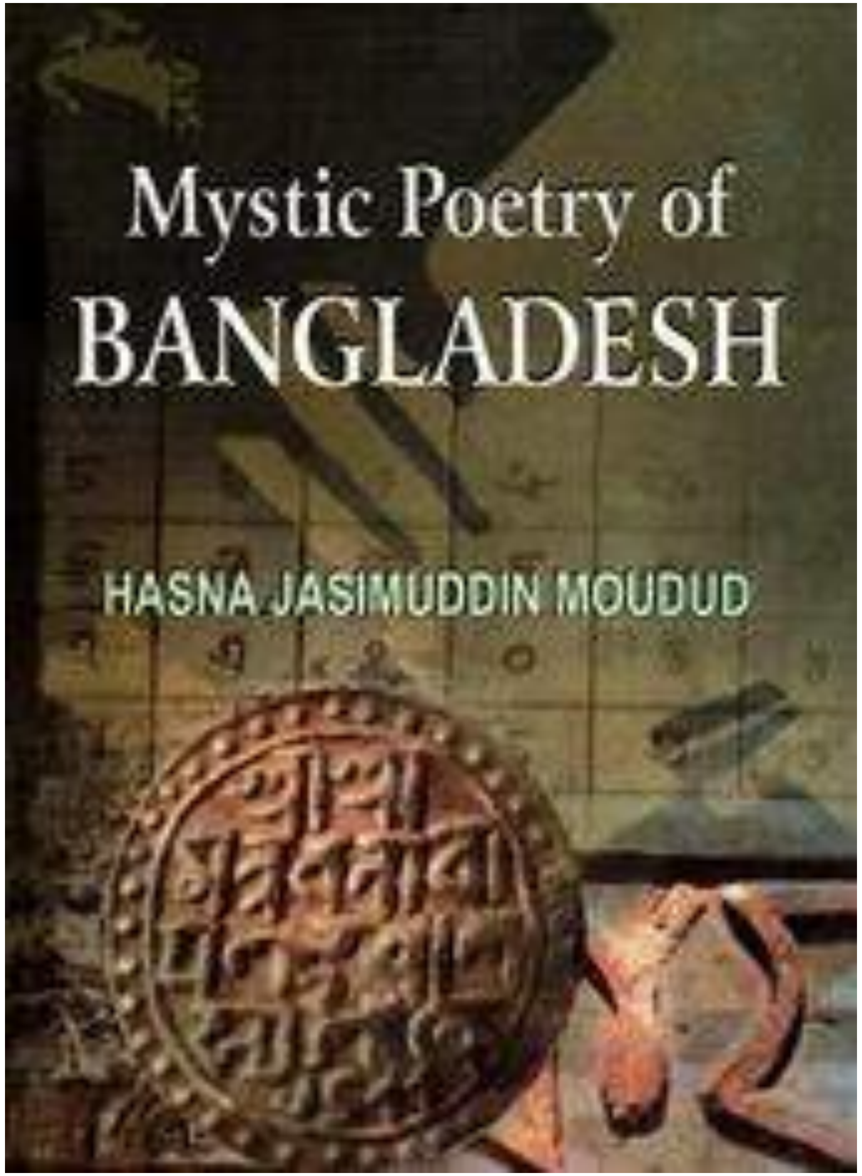

১৯২৭

চর্যাপদের অর্ন্তর্নিহিত তত্ত্ব

- ১৯৪৬ সালে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত সহজযান প্রসঙ্গে চর্যাপদের অর্ন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন।

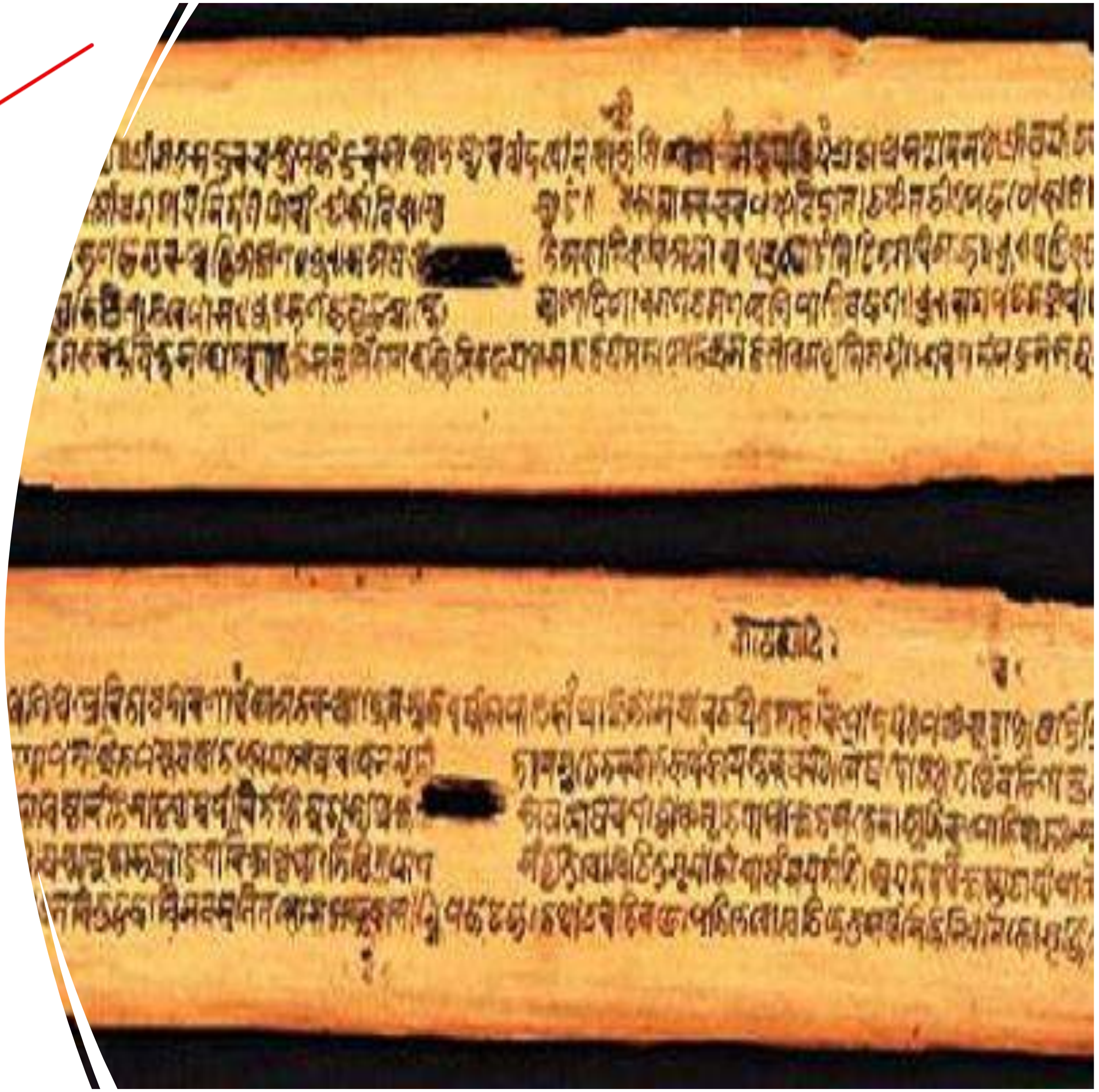

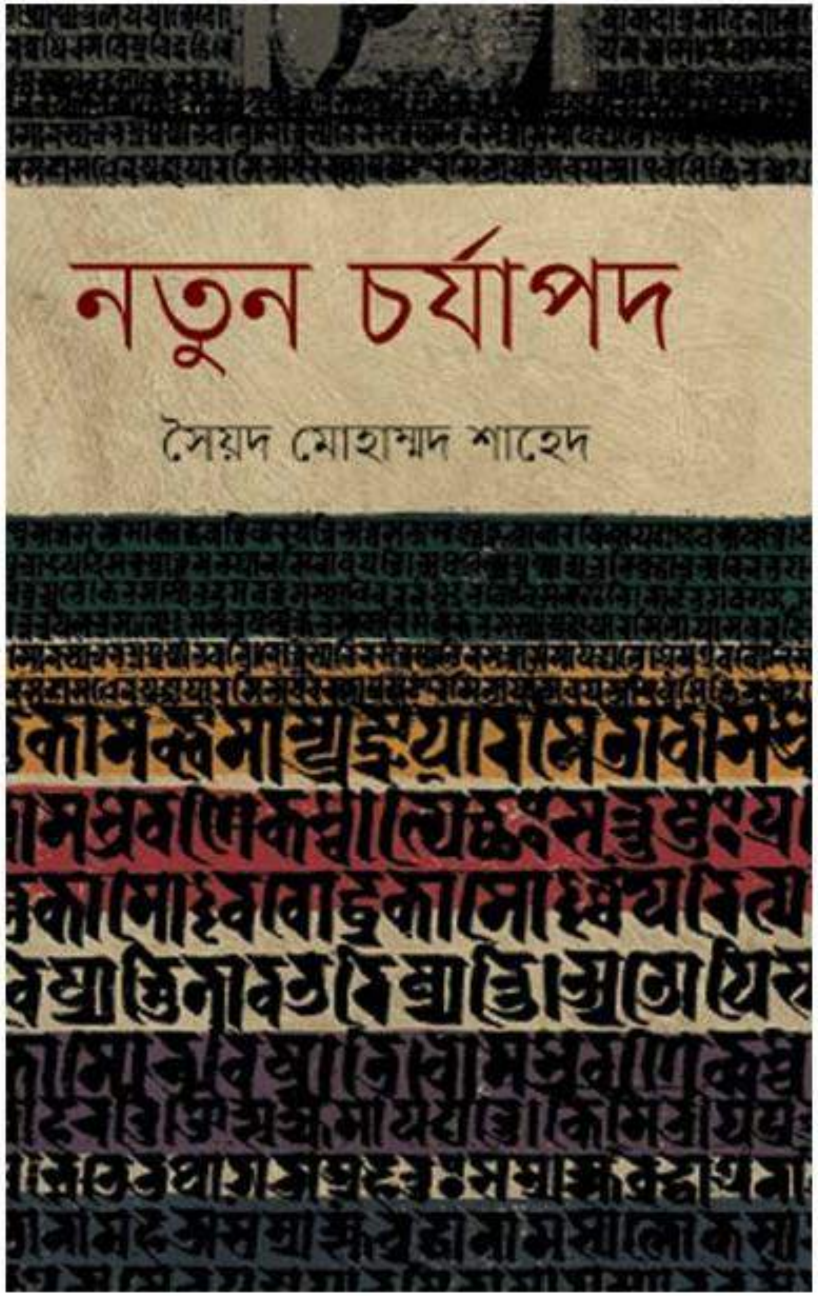

নতুন চর্যাপদ

- চর্যাপদ প্রকাশের পর গত ১০০ বছরে বাংলাদেশে ও দেশের বাইরে চর্যাপদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এ ধারায় সর্বশেষ কাজটি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ।

- ২০১৭ সালের একুশের বইমেলায় প্রকাশিত হয় তার বই ‘নতুন চর্যাপদ'।

Thank You